Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 51-64
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.048

সত্যতার স্বরূপ ও মানদণ্ড: একবিংশ শতকের প্রেক্ষিতে প্রধান দার্শনিক মতবাদসমূহের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ড. শুভজিৎ দত্ত, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কুমারগঞ্জ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.01.2026; Accepted: 15.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The meaning of truth is very difficult to define. Western philosophy shows how complicated this concept is. Different theories of truth include correspondence, coherence, pragmatism, and semantic theories. Each of these tries to account for the differences in a statement but focuses on different aspects. There are those who care about truth matching reality, and others who care about a system, or pay attention to practical considerations. The article addresses the issues of the twenty-first century, such as mediation, linguistic, and epistemic pluralism, and the current truth crisis. Aside from these issues, the article explains that recent advancements in truth theory do not bypass traditional controversies but rather shift the classical conflicts of realism/anti-realism, objectivity/practice, and explanatory/conceptual economy. Using the method of comparative conceptual analysis, the paper assesses the explanatory power and limitations of each theory under contemporary epistemic conditions. In this respect, the paper shows that different theoretical construals of truth can justify different correctness standards. In the end, only a comparative perspective will demonstrate the dynamics behind the continuity and the innovativeness of the truth theories deployed in contemporary Western philosophy. It argues that the prevailing epistemic complexity cannot be resolved with a single theory, but instead proposes that a more suitable solution is an integrated, context-sensitive theory of truth.

Keywords: Truth; Correspondence Theory; Coherence Theory; Pragmatism; Semantic Theory' Convention T; Digital Information Age; Context-Sensitive Truth.

দর্শনে সত্যতা নিয়ে কথা বলাটা কখনোই সহজ ছিল না। সত্যতা পাশ্চাত্য দর্শনের একটি মৌলিক ও কেন্দ্রীয় ধারণা। বস্তুত, আমরা যদি ভেবে দেখি, দর্শনের ইতিহাসে এমন খুব কম ধারণাই আছে যা এতবার আলোচিত হওয়ার পরেও এত অস্পষ্ট রয়ে গেছে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা হয়তো সহজেই দাবি করতে পারি, 'এটা সত্য,' কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে এই ধরনের নিশ্চয়তা টেকে না। তাহলে, 'সত্য' বলতে আমরা কী বুঝি, এবং একটি প্রস্তাবনা সত্য কিনা তা আমরা কীভাবে নির্ধারণ করি? এই দুটি বিষয়কে একই মনে হতে পারে, কিন্তু এদের স্বতন্ত্র দার্শনিক অর্থ রয়েছে, এবং এখানেই অনেক মতবিরোধের সূত্রপাত হয়।

সমসাময়িক পশ্চিমা দর্শনে সত্য সম্পর্কে যে ধারণাগুলো উঠে এসেছে, সেগুলো প্রায়শই ভিন্ন ভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করে। অন্য কিছু দৃষ্টিকোণ অনুসারে, একটি ধারণার বাস্তবতা নির্ভর করে সেটি কতটা উপযোগী বা প্রয়োগযোগ্য তার উপর।সমস্যা হলো, এই ধারণাগুলোকে প্রায়শই বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করা

হয়, যেন তারা একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে না। এর কারণ হলো এই বিষয়টির জটিলতা। এর ফলস্বরূপ, সত্য সম্পর্কিত আলোচনাকে পরস্পরবিরোধী সংজ্ঞার একটি সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই মনে হতে পারে না। অন্যদিকে, আরও গভীর অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে বিতর্কের প্রধান বিষয়গুলো সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে অন্তর্নিহিত নেই, বরং সত্যের মানদণ্ডের মধ্যেই নিহিত।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে একবিংশ শতাব্দীতে এই সমস্যাগুলোর তীব্রতা আরও বেড়েছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলো এত দ্রুত তথ্য ছড়িয়ে দেয় যে, পুরোনো পদ্ধতিতে এর সত্যতা যাচাই করা প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা একই বিষয়ে একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বেশ কিছু বিবৃতির সম্মুখীন হই, এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে অসংখ্য দৃষ্টিভঙ্গিও দেখতে পাই। যখন এমনটা ঘটে, তখন কোন দাবিগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এবং কোন যুক্তিগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচনা করা উচিত, তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, একটি দাবি হয়তো কঠোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে একই দাবি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে, অনেক কম কঠোর মানদণ্ডের ভিত্তিতে গৃহীত হতে পারে।

ফলস্বরূপ, এই প্রবন্ধে সত্যকে একটি সুনির্দিষ্ট, সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখার চেষ্টা করা হয়নি। বরং, এতে একটি তুলনামূলক এবং পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। একটি সুসংহত বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো ব্যবহার করে, আমরা সমসাময়িক পশ্চিমা দর্শনে সত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধারণাগুলো অনুসন্ধান করব। এই তত্ত্বগুলোর মধ্যে রয়েছে অনুরুপতাবাদ, সংসক্তিবাদ, এবং প্রয়োগবাদ। এছাড়াও, ভাষা ও কাঠামো কীভাবে সত্যের মান নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে, সে বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য শব্দার্থিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এর লক্ষ্য শতভাগ সন্তোষজনক কোনো সমাধান প্রদান করা নয়। বরং, এই লেখাটি সত্য সম্পর্কিত বর্তমান দার্শনিক সমস্যা এবং দার্শনিক যুক্তিগুলোর একটি সত্যনিষ্ঠ, তুলনামূলক এবং আধুনিক বিশ্লেষণ প্রদানের চেষ্টা করে।

সত্যতার স্বরূপ ও মানদণ্ড: ধারণাগত কাঠামো:

যখন আমরা ভাবতে শুরু করি যে সত্যতা আসলে কী, তখন প্রথম যে সমস্যাটি সামনে আসে তা মূলত ধারণাগত। আমরা প্রায়শই ধরে নিই যে সত্যতার একটি পর্যাপ্ত সংজ্ঞা দিলেই সমস্যাটির সমাধান করা যাবে। কিন্তু বিষয়টি যতটা সহজ মনে হয় ততটা সহজ নয়। দর্শনে সত্যতা নিয়ে আলোচনার দীর্ঘ ইতিহাস দেখলে এটা স্পষ্ট হয় যে, সত্যতাকে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। আর সেই সংজ্ঞা থেকে অর্থপূর্ণ ও ব্যবহারযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আরও অনেক কঠিন। এই পর্যায়ে, সত্যতার সারমর্ম এবং যে মানদণ্ডগুলো এটিকে সংজ্ঞায়িত করে, তাদের মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদি এই দুটি বিষয়কে আলাদাভাবে বিবেচনা না করা হয়, তবে অনেক আলোচনাই অর্থহীন মনে হবে। আমরা সাধারণত একই সাথে দুটি ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। একদিকে, আমরা সত্যতা সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে আগ্রহী। অন্যদিকে, আমরা সেই প্রক্রিয়াটি জানতে আগ্রহী যার মাধ্যমে আমরা মূল্যায়ন করি যে একটি বিবৃতি সত্য কি না। এই দুটি প্রশ্ন দর্শনের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে তা একরকম নয়, যদিও শুনতে এগুলো একে অপরের সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে, মনে হয় যে এই দুটি বিষয়কে আলাদা করা অনেক জটিলতা দূর করতে সহায়ক। এই কারণে, যখনই আমরা সত্যতা নিয়ে কথা বলতে শুরু করি, তখনই একটি পার্থক্য সামনে আসে যা তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা প্রায়ই একসঙ্গে দুটো আলাদা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাই। একদিকে রয়েছে সত্যতার প্রকৃতি, যা বোঝায় সত্যতা কী ধরনের ধারণা বা বৈশিষ্ট্য বহন করে। অন্যদিকে রয়েছে সত্যতার মানদণ্ড, যা সেই পরিস্থিতিগুলোকে বোঝায় যার অধীনে আমরা একটি বিবৃতি, বিশ্বাস বা

প্রস্তাবকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করি। দর্শনের ইতিহাসের ধারায়, এই দুটি বিষয়কে প্রায়শই একে অপরের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, আবার অন্য সময়ে সেগুলোকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এর বিপরীতে, সমসাময়িক পশ্চিমা দর্শনে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এই পার্থক্যকে উপেক্ষা করার ফলে সত্যতার ধারণার ক্ষেত্রে অসংখ্য মৌলিক হেঁয়ালি অমীমাংসিত থেকে যায়।

সত্যতার প্রকৃতি বলতে সাধারণত বোঝায়, সত্যতা কী ধরনের বিষয়? এটি কি বাস্তব জগতের একটি বৈশিষ্ট্য নাকি আমাদের ভাষা, জ্ঞান বা ধারণাগত কাঠামোর মধ্যেকার একটি নির্মিতি? অনুরূপতাবাদ এই প্রশ্নের একেবারে সোজাসাপ্টা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। এই তত্ত্ব অনুসারে একটি বিবৃতি তখনই সত্য যখন তা বাস্তবের সাথে মিলে যায়। এই পদ্ধতিটি দৈনন্দিন জীবনের অনেক পরিস্থিতিতেই উপযোগী। যখন কোনো ব্যক্তি দাবি করে যে বইটি টেবিলের উপর আছে, তখন আমরা টেবিলের কাছে যাই এবং বইটির উপস্থিতি নিশ্চিত করি। মানুষ যখন সত্যতার সারমর্ম নিয়ে কথা বলে, তখন তারা প্রায়শই সত্য কী, সে সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ ধারণার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে, সত্যতা বলতে এমন কিছুকে বোঝানো হয় যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি তা থেকে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান কোনো বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে, এই ধারণাটি প্রথম দর্শনে যতটা সহজ মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল, কারণ বাস্তবতা নিজেই প্রতিটি প্রেক্ষাপটে একই ভাবে প্রকাশ পায় না। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় এই মডেল সব জায়গায় সমানভাবে খাটে না। গাণিতিক বা নৈতিক সত্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতার সঙ্গে অনুরূপতা বলতে ঠিক কী বোঝানো হবে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এই সমস্যাগুলো আমাদের মানদণ্ড নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। প্রশ্ন হলো, কোন দাবিগুলো করা উপযুক্ত, তা আমরা কীভাবে নির্ধারণ করব? অনেক ক্ষেত্রে, বাস্তবতার নিরিখে কোনো কিছুকে স্পষ্টভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না; তবুও, একটি বিশ্বাস আমাদের কাছে যৌক্তিক মনে হতে পারে কারণ সেটি অন্যান্য বিশ্বাসের সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খায়। সংসক্তিবাদের ক্ষেত্রে এই বিশেষ দিকটির উপর জোর দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও, এই বিষয়েও কিছু অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। গেছে। একটি বিশ্বাস ব্যবস্থা অত্যন্ত সুসংগঠিত হলেও, এটি কি নিশ্চিত করে যে এটি কোনোভাবে বাস্তব জগতের সাথে সম্পর্কিত? এমন অনেক মানসিক ব্যবস্থার উদাহরণ পাওয়া যায় যা অভ্যন্তরীণভাবে অত্যন্ত সুসংহত ছিল, কিন্তু বাস্তবতার সাথে সেগুলোর সম্পর্ক ছিল দুর্বল। এই ধরনের চিন্তাব্যবস্থা ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে খুঁজে পাওয়া যায়।

অন্যদিকে আমরা দেখি যে প্রয়োগবাদী পদ্ধতিটি কিছুটা ভিন্নভাবে কাজ করে। সুতরাং, যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হলো: একটি নির্দিষ্ট ধারণা আমাদের জন্য কী ধরনের ফলাফল বয়ে আনে? কী করতে হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, সমস্যার সমাধান খোঁজার ক্ষেত্রে বা ভবিষ্যৎ পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে এটি কতটা উপযোগী? এই পর্যায়ে প্রয়োগবাদ একটি কিছুটা ভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে। সত্যতা কি কেবলই সম্মতি বা সামঞ্জস্যের বিষয়, নাকি এটি দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে সম্পর্কিত? কোনো ধারণা যদি আমাদের কাজে সাহায্য করে, যদি আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, অথবা যদি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে সঠিক পূর্বাভাস দেয়, তবে কি তাকে সত্য বলা সম্ভব? বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি অত্যন্ত প্রচলিত। অসংখ্য অনুমান দীর্ঘকাল ধরে সফল হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে সেগুলোকে পরিবর্তন করা হয়েছে বা এমনকি পরিত্যাগও করা হয়েছে। তবে, সেই পুরো সময় জুড়ে আমরা সেগুলোকে সঠিক বলতে দ্বিধা করিনি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অন্যদিকে, যা কিছু সহায়ক, তা যে সর্বদা সঠিক হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে, এমন পরিস্থিতিও আছে যখন কার্যকারিতা কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী সাফল্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেকার সংঘাত স্পষ্টভাবে দেখায় যে সত্যতার প্রকৃতি ও মানদণ্ড পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং পরিপূরক। সত্যতার সারসত্তা সম্পর্কিত আলোচনা সত্যতা সম্পর্কে আমাদের মৌলিক বোঝাপড়াকে স্পষ্ট করে, বিশেষ করে বাস্তবতা, ভাষা এবং জ্ঞানের সাথে এর সম্পর্ককে। অন্যদিকে, সত্যতার মানদণ্ড সম্পর্কিত আলোচনা ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন, বিচার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগকে স্পষ্ট করে। সুতরাং, সত্যতার সারসত্তাকে বিবেচনা না করে একটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাটি ধারণাগতভাবে অর্থহীন হয়ে পড়ে, অন্যদিকে মানদণ্ডের উল্লেখ ছাড়া কেবল সত্যতার সারসত্তার উপর একচেটিয়া মনোযোগ সত্যতাকেএকটি বিমূর্ত ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। এই দুটি উপাদানের সমন্বয় সত্য সম্পর্কে দার্শনিক অনুসন্ধানকে ব্যাপক করে তোলে।

অনুরুপতাবাদ:

সত্যতা নিয়ে আলোচনা করার সময় অনুরুপতাবাদকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অ্যারিস্টটল ছিলেন অনুরুপতাবাদের সমর্থক। অ্যারিস্টটল সত্যকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন যে,

> "to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true, while to say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false."[1]

অনুরুপতাবাদ হলো সত্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রভাবশালী মতবাদ। যখন আমরা দেখি যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা 'সত্য' শব্দটি কীভাবে ব্যবহার করি, তখন প্রায়শই মনে হয় যে এই তত্ত্বটি সেই ব্যবহারের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যখন কেউ আমাদের বলে, আজ বৃষ্টি হচ্ছে, এবং আমরা বাইরে তাকিয়ে দেখি যে সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছে, তখন আমরা সাধারণত কোনো জটিল তাত্ত্বিক প্রশ্ন করি না। যেহেতু বিবৃতিটি ঘটনার বর্তমান অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই এটি সঠিক। এই স্পষ্ট এবং প্রায় স্বজ্ঞাত ধারণাটিকেই অনুরুপতাবাদের মাধ্যমে দার্শনিক পরিভাষায় প্রকাশ করা হয়, যা বেশ সহজ। অনুরুপতাবাদের মূল ভিত্তি হলো বস্তুবাদ। অনুরুপতাবাদী সত্যতত্ত্বকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন বার্ট্রান্ড রাসেল। তাঁর মতে,

> "Truth consists in some form of correspondence between belief and fact"[2]

প্রাথমিকভাবে, এই ধারণাটি বেশ সহজ মনে হয়। এই প্রেক্ষাপটে, একদিকে থাকে একটি বিবৃতি, অন্যদিকে বাস্তবতা, এবং সত্য হলো এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেকার সংযোগ। এই ধরনের সংযোগ আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খুঁজে থাকি, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল থেকে শুরু করে সাধারণ কথোপকথন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, একটি বিবৃতিকে তখনই সত্য বলে মনে করা হয় যখন তা বাস্তব জগতে ঘটে যাওয়া কোনো পরিস্থিতি বা ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই প্রেক্ষাপটে, সত্যের মানদণ্ড খুব জটিল নয়। সারসংক্ষেপে, যে প্রশ্নটির উত্তর দিতে হয় তা হলো, বিবৃতি দ্বারা উপস্থাপিত পরিস্থিতিটি বাস্তবে সত্যই বিদ্যমান আছে কি না। সত্যের সারমর্ম অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল, এবং ব্যবহৃত মানদণ্ডটি হলো অভিজ্ঞতামূলক। এই প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ এবং যাচাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গতি তত্ত্বের আকর্ষণ প্রদর্শনকারী উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি থার্মোমিটার একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা দেখাচ্ছে কি না তা নির্ধারণ করা, অথবা একটি মানচিত্র বাস্তব ভূ-প্রকৃতিকে কতটা সঠিকভাবে চিত্রিত করে তা নির্ধারণ করা।

---

[1] Aristotle, *Metaphysics*, trans. W. D. Ross, in *The Works of Aristotle*, ed. Mortimer J. Adler and Philip P. Wiener, vol. 7 of *Great Books of the Western World* (Chicago: Encyclopædia Britannica, 1952), 531 (1011b25).

[2] Bertrand Russell, *The Problems of Philosophy* (London: Williams and Norgate, 1912), 121.

অন্যদিকে, যখন আমরা বিষয়টির দিকে আরও যাই, তখন আমরা আবিষ্কার করি যে এটি অতিরিক্ত জটিল হয়ে ওঠে। আমরা যখন "বাস্তবতা" শব্দটির নির্দিষ্ট অর্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করি তখনই তখনই সমস্যাটি দেখা দেয়। কোন উপায়ে আমরা বাস্তবতা সম্পর্কে চিন্তা করার প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকি এবং আমরা বাস্তবতা হিসাবে ঠিক কী স্বীকৃতি দিই? এটি কি এমন কিছু যা আমাদের ভাষা এবং ধারণা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, নাকি বাস্তবতা বোঝার জন্য আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, তা নিজেই বাস্তবতাকে আকার দেয়, তা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র একটি ভাল উদাহরণ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে, আমরা নির্ধারণ করতে সক্ষম হই যে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিশ্বের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ যা আমরা আসলে জানতে পারি এবং অনুভব করি। তা সত্ত্বেও, পরীক্ষাটি নিজেই এমনভাবে পরিচালিত হয় যা একটি নির্দিষ্ট ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একটি নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক স্থাপত্যের পরামিতিগুলির মধ্যে রয়েছে। যখন কেউ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি বর্ণনা করা বা ভবিষ্যতের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকে, তখন এই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা থেকে বিরত থাকা বিশেষত কঠিন। যখনই এই জাতীয় কিছু ঘটে, সত্যটি হয় সম্পূর্ণ নীরব থাকে অথবা আংশিকভাবে অধরা। এখানে অনুরুপতা সরল আয়নার মতো কাজ করে না, বরং, এটি বেশ পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নৈতিক বা বিমূর্ত দাবিগুলি মোকাবেলা করার সময় আরও সমস্যা দেখা দেয়। 'ন্যায়বিচার গুরুত্বপূর্ণ' বা 'এই আইনটি অন্যায়'- এর মতো বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে সংবাদদাতা বাস্তব জগতে কোন ধরণের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করবেন? অনুরুপতাবাদ এখানে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে। ঠিক এই মুহূর্তে, অনুরুপতাবাদের ত্রুটিগুলি সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই তত্ত্বটি প্রমাণ করে যে বাস্তবতা মানুষের ভাষা এবং জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র একটি স্থিতিশীল কাঠামো হিসাবে বিদ্যমান। কিন্তু ভাষা নিজেই মাঝে মাঝে বাস্তবতাকে বেছে নেয়, ব্যাখ্যার মাধ্যমে রূপ দেয় এবং এমনকি পরিবর্তন করে। একটি রাজনৈতিক ঘটনার দুটি ভিন্ন ব্যাখ্যা একই 'বাস্তবতা' সম্পর্কে হতে পারে, তবে তারা একে অপরের সাথে একমত নয়। সুতরাং কোনটি সঠিক? কোন তথ্যকে সামনে আনা হয়, কোনটি গোপন রাখা হয় এবং কোন ভাষায় ঘটনাটি বর্ণনা করা হয় তার উপর নির্ভর করে এই আখ্যানগুলির রূপ পরিবর্তিত হয়। এটি প্রশ্ন উত্থাপন করে: এই আখ্যানগুলির মধ্যে কোনটি সত্য হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত, এবং কে সেই সত্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করবে? অন্যদিকে, অনুরুপতাবাদকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা কোনও সহজ কাজ নয়। এটি বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে, অনুরুপতাবাদ বাস্তবতার মানদণ্ড হিসাবে আমাদের চিন্তাভাবনায় এতটাই দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেছে যে অন্যান্য তত্ত্বগুলি প্রায়শই এর সাথে নীরব কথোপকথনে লিপ্ত হয়। অন্যদিকে, এটিকে একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা সত্যতার অনেক সামাজিক, ভাষাগত এবং প্রাসঙ্গিক মাত্রাকে অস্পষ্ট করে তোলে। এই সীমাবদ্ধতার কারণে, আমরা পরবর্তী তত্ত্বের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হই, যা বলে যে সত্যতাকে সরাসরি বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখাই শেষ কথা নয়।

সংসক্তিবাদ:

সংসক্তিবাদ মূলত ভাববাদী (Idealist) দার্শনিকদের দ্বারা বিকশিত হয়েছে। স্পিনোজা, লাইবনিজ এবং এফ.এইচ, ব্র্যাডলি এর প্রধান সমর্থক । অনুরুপতাবাদ দাবি করে যে সত্যকে বাহ্যিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। সংসক্তিবাদ সেখানে একটু থেমে যায় এবং মিল বলতে আমরা আসলে কী বুঝি তা নিয়ে চিন্তা করে। সত্য কি শুধুমাত্র একটি বিবৃতির সাথে একটি একক ঘটনার সামঞ্জস্য, নাকি সত্যের ধারণাটি আমাদের বিশ্বাসের আন্তঃসম্পর্কের সাথে গভীরভাবে যুক্ত? সংসক্তিবাদ দ্বিতীয় বিকল্প পথটি

বেছে নেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা গেলে, একটি একক বিবৃতিকে নিজের দ্বারা মূল্যায়ন করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ নয়। পরিবর্তে, এর সত্যতা বৃহত্তর বিশ্বাস ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই কাঠামোর ভেতরেই তার সত্যতা নির্ধারিত হয়। একটি বিবৃতি সত্য বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য, এটি আমাদের অন্যান্য চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস এবং ব্যাখ্যার বিরোধী হওয়া উচিত নয়; বরং, এটা তাদের সাথে একমত হতে হবে। এই প্রসঙ্গে Ralph C. S. Walker মন্তব্য করেন যে,

> "According to the coherence theory of truth, we have a great many beliefs about the content of our experience, but as with any other beliefs, their truth can only consist in their coherence within the system; and if that means that the system must be a rich and elaborate system, well and good."[3]

আমাদের প্রতিদিনের তথ্য অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধারণাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা নয়। উদাহরণস্বরূপ, ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে আমরা কীভাবে বিচার করি, তা বিবেচনা করুন। ঘটনাটি সরাসরি আমাদের সামনে এনে পরীক্ষা করা যায় না যেহেতু এটি সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও, যখন আমরা বিভিন্ন সূত্র, সাক্ষী এবং গৃহীত ব্যাখ্যার আলোকে একটি বর্ণনা পরীক্ষা করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে এটি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। একটি দাবির শক্তি বৃদ্ধি পায় যখন এটি অতীতে জানা তথ্যের বিরোধিতা করে না বরং এই ধরনের ব্যাখ্যাকে আরও পরিষ্কার করে। এই কারণে, সংসক্তিবাদ এমন ক্ষেত্রগুলোতে আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যেখানে তথ্য শ্রেণিবদ্ধ এবং পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত হয়। অধ্যয়নের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যার মধ্যে গণিত, নীতিশাস্ত্র এবং এমনকি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার কিছু দিক রয়েছে, যেখানে আমরা প্রায়শই দেখি যে সত্যকে একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থার ভেতরে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। কারণ এটি সামগ্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার পরিবর্তে শক্তিশালী করে, এবং এর ফলে একটি সূত্র বা একটি নৈতিক ধারণাকে বৈধ বলে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে, সংসক্তিবাদের এই শক্তিও তার সীমাবদ্ধতা হয়ে দাঁড়ায়। একটি বিশ্বাস ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণভাবে সম্পূর্ণরূপে সুসংগত হতে পারে, যদিও বাস্তবতার সাথে এর সংযোগ এখনও ক্ষীণ বা প্রতারণামূলক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ষড়যন্ত্র তত্ত্বের ধারণাটি বিবেচনা করুন। সেখানে, একটি বিশ্বাস অন্য বিশ্বাসের সাথে ভালভাবে খাপ খায় এবং মনে হয় প্রতিটি প্রশ্নের সমাধান রয়েছে। যদিও পুরো কাঠামোটি বাইরের বিশ্বের পরিদর্শন সহ্য করতে সক্ষম নয়। যখনই সেই অভ্যন্তরীণ পুরো কাঠামোটিকে প্রকৃত ঘটনা, ঘটনা বা বাস্তব ঘটনার, প্রমাণ বা ভিন্ন ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়, তখনই তা কেবল বৃত্তে ঘুরে যায়।

তবুও, সংসক্তিবাদকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। এটি এমন কিছু যা আমরা প্রায়শই সম্মুখীন হই, বিশেষ করে গণিত, নৈতিক দর্শন এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে, যেখানে অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে সত্যকে মূল্যায়ন করা হয়। একটি সূত্র বা নৈতিক নীতি গ্রহণ করা হয় যেহেতু এটি সমগ্র কাঠামোর অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য এবং ব্যাখ্যাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করার জন্য দায়ী। সংসক্তিবাদের কেন্দ্রীয় দাবিটি সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে Joachim-এর বক্তব্যে। তাঁর মতে,

> "Truth in its essential nature is that systematic coherence which is the character of a significant whole."[4]

[3] Michael P. Lynch, Jeremy Wyatt, Junyeol Kim, and Nathan Kellen, eds., T*he Nature of Truth: Classic and Contemporary Perspectives*, 2nd ed. (Cambridge, MA: MIT Press, 2021), 126.
[4] Harold H. Joachim, *The Nature of Truth* (Oxford: Clarendon Press, 1906), 76.

এই সংজ্ঞায় সত্যকে কোনো বিচ্ছিন্ন বিবৃতি হিসেবে নয়, বরং একটি অর্থবহ সামগ্রিক কাঠামোর অভ্যন্তরীণ সংগতি হিসেবে বোঝা হয়।

তদনুসারে, এটা নিশ্চিত করা সম্ভব যে সংসক্তিবাদ আমাদের নজরে আনতে সাহায্য করে যে সত্যতা কেবল বাহ্যিক বিশ্বের আয়না নয়। এটি দেখায় যে জ্ঞানের অভ্যন্তরীণ কাঠামো, ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতা এবং একাধিক বিশ্বাসের আন্তঃসম্পর্ক সত্যের নির্মাণে অবদান রাখে। এই আলোকে দেখা হলে, সংসক্তিবাদ এই ধারণাটি প্রকাশ করে যে সত্যতা একটি সম্পর্কযুক্ত শব্দ, যেখানে পুরো বিশ্বাস ব্যবস্থাকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে বাস্তবতা ও সত্যতার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন এটি ঘটে, তখন সত্য তার নিজের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এটি যে অস্বস্তি সৃষ্টি করে তা নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলির জন্ম দেয়, যেখানে সত্যকে কেবল পুরো বিশ্বাস ব্যবস্থাকে সংগতির সমস্যা হিসাবে দেখা হয় না, তবে কর্ম, ফলাফল এবং প্রসঙ্গ প্রয়োগের আলোকেও দেখা হয়।

প্রয়োগবাদ:

আমেরিকান দার্শনিক সি.এস.পিয়ার্স, উইলিয়াম জেমস এবং জন ডিউই এই মতবাদের প্রবক্তা। অনুরুপতাবাদ ও সংসক্তিবাদের আলোচনার পর আমরা দেখতে পাই প্রয়োগবাদ যেন হঠাৎ করে অনুসন্ধানের জোরকেই ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়। সংসক্তিবাদে আমরা দেখতে পাই যে এটি বিশ্বাসের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের মধ্যে সত্যকে খুঁজে পায়, যখন অনুরুপতাবাদ সত্যতা বাস্তবতার সাথে একমত কিনা তা সেখানে সীমাবদ্ধ করে। প্রয়োগবাদ অনুসারে, সত্যতা আর কেবল একটি ধারণাগত বৈশিষ্ট্য নয়, এটি একটি নির্দিষ্ট গুণ নয় বরং এমন কিছু যা যা কাজের ভেতর দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করে। প্রয়োগবাদী সত্যতত্ত্বের মূল সুরটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে William James-এর বক্তব্যে। তাঁর মতে,

> "The 'true' is only the expedient in the way of our thinking, just as the 'right' is only the expedient in the way of our behaving."[5]

প্রয়োগবাদী ভাবনায়, কোনো ধারণাকে শুধুমাত্র তখনই সত্য বলে গণ্য করা হয় যদি এটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কার্যকর হয় এবং অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থবহ ফলাফল তৈরি করে। এই প্রেক্ষাপটে, সত্য একটি পূর্ব-বিদ্যমান জিনিস নয় যা আমরা আমাদের পরীক্ষা জুড়ে একবারে খুঁজে পাই। অন্যদিকে, সত্য একটি চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয় যা অন্বেষণ, প্রয়োগ এবং পরিমার্জন জড়িত। ফলস্বরূপ, সত্যতাকে একটি স্থায়ী সম্পত্তি হিসাবে নয়, বরং একটি চলমান, অব্যাহত, উন্মুক্ত প্রক্রিয়া হিসাবে বোঝার চেষ্টা করে যা পরিস্থিতি এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। প্রতিদিনের উদাহরণ জিনিসগুলিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। চিকিৎসা গবেষণার ক্ষেত্রে, একটি অনুমান শুধুমাত্র শেষ শব্দ হতে পারে না। নতুন তথ্য উঠলে এটি পরিবর্তন হতে পারে। যাইহোক, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি অসুস্থতা নিরাময়ে কার্যকর হয়, লোকেরা এটিকে কার্যকর হিসাবে গ্রহণ করে। একইভাবে, শিক্ষা এবং সামাজিক নীতির ক্ষেত্রে, আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করি যে বাস্তবে কাজ করে এমন একটি ধারণা এই মুহূর্তে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দার্শনিক তাৎপর্যের উপর জোর দেয়। এখানে, সত্য নিখুঁত মিল বা চূড়ান্ত সামঞ্জস্য বোঝায় না, বরং ব্যবহারিক ফলাফলকে বোঝায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান শক্তি হল প্রয়োগবাদ সত্যতাকে এবং জীবনকে

[5] William James (1842–1910), *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking* (New York: Longmans, Green, and Co., 1907), 222.

নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করে। এখানে সত্য কেবল তাত্ত্বিক সংগতি বা বাস্তবতার চিত্রের চেয়ে বেশি। বিমূর্ত ধারণার পরিবর্তে, কর্ম, অভিজ্ঞতা এবং ফলাফলের উপর জোর দেওয়া হয়। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্ম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই প্রেক্ষাপটে, জানা মানে শুধু বোঝার জন্য নয় বরং কিছু করতে সক্ষম হওয়া, বা অন্তত ভবিষ্যৎ কর্মের জন্য পথ প্রশস্ত করা।

অন্যদিকে, এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, যা কাজ করে সেটাই কি সবসময়ই সত্য? কিভাবে একটি ধারণার সত্যতা বিবেচনা করা উচিত যদি এটি প্রথমে উপকারী হয় কিন্তু পরে তা ক্ষতিকর হয়? স্বল্পমেয়াদে সফল হলেও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর হয়ে উঠলে একটি ধারণা প্রকৃত কিনা তা নির্ধারণ করতে কী মানদণ্ড ব্যবহার করা উচিত? যখন কেউ রাজনৈতিক স্লোগান বা প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অনেকগুলি জিনিস কার্যকর এবং ব্যক্তির আচরণের উপর প্রভাব ফেলে; তা সত্ত্বেও, আমরা তাদের সত্য বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করি। প্রয়োগবাদ, এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। এটি সত্যতার আলোচনায় একটি অপরিহার্য নতুন মাত্রা প্রদান করে। এটি প্রমাণ করে যে সত্যতাকে এমনভাবে ধারণা করা যায় না যা অস্তিত্বের ব্যবহারিক উদ্বেগগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সত্য যে কেবল একটি ধারণাগত নির্মাণ নয় তা এখানে দেখানো হয়েছে। সত্যতা আমাদের সিদ্ধান্ত, কর্ম এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সাথে গভীরভাবে জড়িত। ফলস্বরূপ, সত্যের আলোচনায়, প্রয়োগবাদ আমাদেরকে কেবল সত্য কী তা নয়, এটি আমাদের জীবনে কীভাবে কাজ করে তাও বিবেচনা করতে বাধ্য করে। প্রয়োগবাদ আমাদের ব্যবহারিক পরিণতির কথাও বিবেচনায় নিতে উৎসাহিত করে।

শব্দার্থিক মতবাদ:

আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানী Alfred Tarski এই মতবাদটি প্রদান করেন। তিনি সত্যতাকে ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। টারস্কি মূলত গণিত এবং আনুষ্ঠানিক ভাষার (Formal Language) জন্য সত্যের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, সাধারণ ভাষায় (Natural Language) 'সত্য' শব্দটি ব্যবহার করলে অনেক সময় 'লায়র প্যারাডক্স' (Liar Paradox) বা স্ব-বিরোধী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্যই তিনি শব্দার্থিক মতবাদ প্রবর্তন করেন। টারস্কির আগে অনুরূপতাবাদ প্রচলিত ছিল, যা বলত 'সত্য হলো বাস্তবের সাথে মিল'। কিন্তু 'মিল' বা 'অনুরূপতা' বলতে ঠিক কী বোঝায়, তার কোনো গাণিতিক বা যৌক্তিক ব্যাখ্যা ছিল না। এছাড়া সাধারণ ভাষায় 'লায়র প্যারাডক্স' (যেমন: 'এই বাক্যটি মিথ্যা') সত্যের ধারণাকে গোলমেলে করে দিত। টারস্কি চাইলেন এমন একটি সংজ্ঞা দিতে যা: যৌক্তিকভাবে নিখুঁত (Logically Formal) হবে এবং বস্তুগতভাবে পর্যাপ্ত (Materially Adequate) হবে।টারস্কির সবচেয়ে বড় অবদান হলো ভাষার স্তরবিন্যাস। তিনি বলেন, একটি ভাষা দিয়ে সেই ভাষারই সত্যতা বিচার করলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। তাই তিনি দুটি স্তর ভাগ করেন: অবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ (Object Language): এটি হলো সেই ভাষা যা দিয়ে আমরা জগত সম্পর্কে কথা বলি। যেমন: "বরফ সাদা" বা 'Snow is white'। এখানে আমরা সরাসরি বস্তু (বরফ) নিয়ে কথা বলছি। মেটা-ল্যাঙ্গুয়েজ (Meta-language): এটি হলো একটি উচ্চতর ভাষা যা দিয়ে আমরা 'অবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ' সম্পর্কে কথা বলি। যখন আমরা বলি— 'বরফ সাদা' বচনটি সত্য'— তখন আমরা বরফ নিয়ে নয়, বরং 'বরফ সাদা' নামক বাক্যটি নিয়ে কথা বলছি। এই উচ্চতর স্তরটিই হলো মেটা-ল্যাঙ্গুয়েজ। টারস্কি সত্যের মানদণ্ডকে একটি সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন, যাকে বলা হয় Convention T: X is true if and only if p। টারস্কির এই ব্যাখ্যাটি দুটি প্রধান কাজ করে। টারস্কি দেখান যে, 'সত্য' শব্দটি আসলে একটি বাক্য থেকে উদ্ধৃতি চিহ্ন সরিয়ে

ফেলার কাজ করে। যখন আমরা বলি 'P' is true, তখন আমরা আসলে P কেই স্বীকার করি। অর্থাৎ, সত্যতা হলো ভাষা এবং জগতের মধ্যকার একটি স্বচ্ছ সেতু। এই মতবাদকে 'শব্দার্থিক' বলা হয় কারণ এখানে সত্যতা নির্ভর করে বাক্যের অর্থের ওপর। টারস্কি তার শব্দার্থিক সত্যতত্ত্বে দেখান যে সত্য কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, বরং এটি ভাষা এবং বাস্তবতার মধ্যে একটি স্পষ্ট সম্পর্ক নির্দেশ করে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, "The sentence 'snow is white' is true if, and only if, snow is white."[6] এই বাণীটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে কোনো বিবৃতির সত্যতা তার অভ্যন্তরীণ কাঠামো বা ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং এটি বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেটির উপর নির্ভর করে। 'Snow is white' বাক্যটি তখনই সত্য হবে যদি 'Snow' বলতে আমরা যা বুঝি তা বাস্তবে 'White' গুণের অধিকারী হয়। অর্থাৎ, সত্যতা হলো শব্দের অর্থের সাথে জগতের সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ।

টারস্কির দার্শনিক অবদান মূলত সত্যকে formal বা আনুষ্ঠানিকভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াসে গড়ে ওঠে। তিনি দেখান যে একটি বাক্য সত্য তখনই, যখন সেটি বাস্তবতার নির্দিষ্ট শর্তের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। তাঁর মূল ভাবনা হলো, কোনো বাক্য তখনই সত্য, যখন তা বাস্তবতার সঙ্গে মিল খায়। এই ধারণা বিশেষভাবে কার্যকর হয় এমন ক্ষেত্রে যেখানে ভাষা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং শর্তগুলো স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, গণিতের কোনো প্রমাণ বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল যাচাই করা সহজ, কারণ এখানে বাক্য ও বাস্তবতার মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট এবং পরীক্ষা করা সম্ভব। টারস্কি শুধু সত্যকে formal ভাবে সংজ্ঞায়িত করেন না, তিনি দেখান কিভাবে ভাষার ভেতরে অর্থ ও সত্যের সম্পর্ক সুসংগতভাবে স্থাপন করা যায়। ফলে, সত্য কেবল ধারণা নয়, বরং এটি এমন একটি কাঠামোর মধ্যে দাঁড়ায় যা আমাদের যাচাই করার ক্ষমতা এবং যুক্তির শক্তিকে সমর্থন করে। টারস্কি সত্যকে বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের সামনে একটি সংযত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পথ রাখেন। টারস্কি প্রমাণ করেন যে 'সত্য' কোনো অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক গুণ নয়। এটি কেবল ভাষার একটি ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য। যেহেতু সত্যের সংজ্ঞা মেটা-ল্যাঙ্গুয়েজে দেওয়া হয়, তাই "এই বাক্যটি মিথ্যা" জাতীয় বাক্যগুলো আর প্যারাডক্স তৈরি করতে পারে না, কারণ একটি বাক্য নিজের স্তরে নিজের সত্যতা ঘোষণা করতে পারে না। এই মতবাদটি গাণিতিক যুক্তিবিদ্যা এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের (Semantics of programming languages) ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তবে দৈনন্দিন জীবন বা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গে এই কাঠামো সরাসরি প্রযোজ্য নয়। সামাজিক মাধ্যম বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়া কোনো দাবি শুধু বাস্তবতার সঙ্গে মিল রাখার মাধ্যমে যাচাই করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, একটি রাজনৈতিক বক্তব্য বা ভাইরাল তথ্য অনেক সময় বাস্তবতার সঙ্গে আংশিক মিল রাখলেও তার প্রভাব, গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রসারণের গতিবেগের কারণে সেটি সমাজে 'সত্য' হিসেবে ধরা হয়। আবার কখনও কোনো বৈজ্ঞানিক ফলাফল সমাজে ভুলভাবে উপস্থাপন হলে, তা দেখতে না পেলে আমরা সহজে সত্যকে ভুল হিসেবে মানতে পারি। এই পরিস্থিতি দেখায়, সত্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে formal শর্ত একার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ডিজিটাল তথ্য যুগে, যেখানে সংবাদ, রাজনৈতিক বক্তব্য, বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং অনলাইন মন্তব্য একসাথে ছড়িয়ে পড়ে, এই সংযত দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এটি আমাদের শেখায় যে সত্য একদিকে formal শর্ত এবং বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত, অন্যদিকে তা ব্যবহারিক প্রভাব, প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সুতরাং, টারস্কির semantic framework এবং বহুত্ববাদ একত্রে প্রমাণ করে যে সত্যকে বোঝার জন্য একক তত্ত্ব যথেষ্ট নয়; বরং একটি সমন্বিত, ক্ষেত্র-

[6] Alfred Tarski, "The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics," *Philosophy and Phenomenological Research* 4, no. 3 (March 1944): 343.

নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমকালীন তথ্যপ্রযুক্তি ও সমাজিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে।

তুলনামূলক দৃষ্টিতে সত্যতা:

সত্যতাকে একক কোনো মানদণ্ডের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা দর্শনের দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে দেখা যায়। এই প্রচেষ্টার পেছনে একটি সহজ আকাঙ্ক্ষা কাজ করে। সত্য যদি এক হয়, তবে তার বিচারও হয়তো একভাবেই সম্ভব। তবে বাস্তবে এই ধারণাটি ক্রমশ প্রশ্নের মুখে পড়েছে। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হয়েছে, ততই স্পষ্ট হয়েছে যে সত্য বিভিন্ন পরিসরে ভিন্নভাবে কাজ করে। এই প্রেক্ষিতে অনুরুপতাবাদ, সংসক্তিবাদ, প্রয়োগবাদ এবং শব্দার্থিক মতবাদকে পাশাপাশি রেখে দেখলে একক সত্যমানদণ্ডের সীমাবদ্ধতা আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

অনুরুপতাবাদ সত্যকে বাস্তবতার সঙ্গে বক্তব্যের মিল হিসেবে বোঝে। কোনো বাক্য তখনই সত্য, যখন তা যে বিষয়ের কথা বলছে, বাস্তবে সেই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এই ধারণা বেশ কার্যকর। 'জল ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ফুটে' ধরনের বক্তব্য সহজেই পরীক্ষণযোগ্য। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় ভাষা ও বাস্তবতার সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠলে। সামাজিক ঘটনা, রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে 'বাস্তবতা' নিজেই একরৈখিক থাকে না। এখানে অনুরুপতাবাদ তার ব্যাখ্যামূলক শক্তির সীমায় পৌঁছে যায়।

এই সীমাবদ্ধতার জায়গাতেই সংসক্তিবাদ ভিন্ন এক পথ দেখায়। এখানে সত্য নির্ধারিত হয় কোনো বক্তব্য এককভাবে বাস্তবতার সঙ্গে মেলে কি না তার দ্বারা নয়, বরং সেটি একটি বৃহত্তর বিশ্বাস-ব্যবস্থার ভেতরে কতটা সুসংগত তার উপর। গাণিতিক তত্ত্ব, নৈতিক দর্শন বা দার্শনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট শক্তিশালী। তবে সংসক্তিবাদের সমস্যাও কম নয়। একটি বিশ্বাস-ব্যবস্থা ভেতর থেকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল হতে পারে, অথচ তা বাস্তব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। ষড়যন্ত্রমূলক চিন্তাধারা এর একটি পরিচিত উদাহরণ। ফলে সংসক্তিবাদ সত্যের অভ্যন্তরীণ গঠন ব্যাখ্যা করলেও বহির্জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক সবসময় নিশ্চিত করতে পারে না।

প্রয়োগবাদ এই দুই অবস্থানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের দিকটাই কিছুটা ঘুরিয়ে দেয়। এখানে জিজ্ঞাসা করা হয় না যে কোনো বক্তব্য বাস্তবতার সঙ্গে ঠিক কতটা মেলে বা কোনো তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে কতটা সুসংগত। বরং জিজ্ঞাসা করা হয়, এই ধারণাটি আমাদের কাজে কী ফল দিচ্ছে। কোনো বিশ্বাস তখনই সত্য হিসেবে গণ্য হয়, যখন তা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কার্যকর প্রমাণিত হয় এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে অর্থপূর্ণ ফল বয়ে আনে। শিক্ষাব্যবস্থা, নীতিনির্ধারণ বা সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তবে প্রয়োগবাদও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। কার্যকারিতা সবসময় নৈতিক বা তাত্ত্বিক যথার্থতার সমার্থক নয়। যা আজ কাজে লাগছে, তা দীর্ঘমেয়াদে সমস্যাজনক হয়ে উঠতে পারে।

এই বিতর্কের মধ্যে শব্দার্থিক মতবাদ একটি ভিন্ন স্তরে সত্যের প্রশ্নটি তোলে। এখানে মূল মনোযোগ ভাষার উপর। সত্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয় আনুষ্ঠানিক ভাষার কাঠামোর মধ্যে, যেখানে কোনো বাক্য তখনই সত্য, যখন সেটি যে অবস্থা বর্ণনা করছে, সেই অবস্থা বাস্তবে বিদ্যমান। " 'বরফ সাদা' বাক্যটি তখনই সত্য, যখন বরফ সত্যিই সাদা" ধরনের উদাহরণ এই পদ্ধতির স্বচ্ছতা বোঝায়। এই কাঠামো যুক্তিবিদ্যা, গণিত ও আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানে অত্যন্ত কার্যকর। তবে ভাষার দৈনন্দিন, রূপকধর্মী বা মূল্যবোধ-নির্ভর ব্যবহারে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে।

এই চারটি দৃষ্টিভঙ্গিকে পাশাপাশি রাখলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রত্যেকটি তত্ত্ব সত্যের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ব্যাখ্যা করে, কিন্তু কোনো একটিও এককভাবে সব ক্ষেত্রকে আচ্ছাদন করতে পারে না। অনুরুপতাবাদ আমাদের বাস্তবতার কথা মনে করিয়ে দেয়, সংসক্তিবাদ চিন্তার কাঠামোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রয়োগবাদ সত্যের ব্যবহারিক দিকটি সামনে আনে, আর শব্দার্থিক মতবাদ ভাষাগত নির্ভুলতার গুরুত্ব তুলে ধরে। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে সর্বজনীন মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করলে সত্যের ধারণা সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ তাই ইঙ্গিত দেয় যে সমকালীন জ্ঞানপরিস্থিতিতে সত্যকে বুঝতে হলে একক মানদণ্ডের মোহ ত্যাগ করা জরুরি। সত্যকে বরং একটি বহুমাত্রিক ধারণা হিসেবে দেখা দরকার, যা ক্ষেত্র, ভাষা এবং ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে। এই উপলব্ধিই পরবর্তী অংশে প্রস্তাবিত সমন্বিত ও প্রেক্ষিত-নির্ভর সত্যতত্ত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করে।

সমন্বিত ও প্রেক্ষিত-নির্ভর সত্যতত্ত্বের প্রস্তাব:

এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় প্রস্তাব হলো যে সমকালীন জ্ঞানপরিবেশে সত্যকে আর কোনো একক তত্ত্বের ভেতরে আটকে রাখা যায় না। ডিজিটাল তথ্য যুগ এবং সমকালীন জ্ঞানপরিবেশে সত্যের মানদণ্ডকে একক কোনো তত্ত্ব দিয়ে বোঝানো বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। অনুরুপতাবাদ আমাদের শেখায় কীভাবে সত্য বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে ভাবা যায়, সংসক্তিবাদ দেখায় বিশ্বাসের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যাখ্যার কাঠামোর গুরুত্ব, আবার প্রয়োগবাদ সত্যকে ব্যবহার ও ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত করে। প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গিই শক্তিশালী, কিন্তু একা একা দাঁড়ালে তারা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাস্তব সমস্যায় আমরা প্রায়ই দেখি যে এক ধরনের মানদণ্ড অন্য ক্ষেত্রে কাজ করে না। একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতি আর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া রাজনৈতিক দাবির সত্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতি এক হতে পারে না। তবু আমরা উভয় ক্ষেত্রেই 'সত্য' শব্দটি ব্যবহার করি। এই ব্যবধানটিই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা সামনে আনে। সুতরাং, একক তত্ত্ব দিয়ে সত্যের জটিলতা মোকাবিলা করা অসম্ভব।

প্রেক্ষিত-নির্ভর সত্যতত্ত্ব বলতে এখানে কোনছর চরম আপেক্ষিকতাবাদ (radical relativism) বোঝানো হচ্ছে না— যেখানে যেকোনো দাবি, যেকোনো পরিস্থিতিতে, সমানভাবে সত্য বলে গণ্য হয়। এই তত্ত্বের মূল দাবি বরং অনেক বেশি সংযত ও দার্শনিকভাবে সূক্ষ্ম। এর প্রস্তাব হলো: সত্য সর্বত্র একই রূপে কাজ করে না; বরং সত্যের মানদণ্ড নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানক্ষেত্র, ব্যবহৃত ভাষার ধরন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের উপর। অর্থাৎ, 'সত্য কীভাবে নির্ধারিত হবে'— এই প্রশ্নটির উত্তর ক্ষেত্রভেদে ভিন্ন হতে পারে, যদিও 'সত্য' ধারণাটির গুরুত্ব সব ক্ষেত্রেই সমান।

উদাহরণস্বরূপ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কোনো বক্তব্যকে সত্য বলে গণ্য করতে হলে সেটিকে পরীক্ষণযোগ্য, পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য হতে হয়। এখানে সত্য যাচাই হয় পরীক্ষাগারের ফলাফল, পরিমাপযোগ্য তথ্য এবং কারণ–কার্য সম্পর্কের মাধ্যমে। এই ক্ষেত্রে অনুরুপতাবাদ বিশেষভাবে কার্যকর, কারণ একটি বৈজ্ঞানিক বক্তব্যকে সত্য বলা হয় তখনই, যখন তা বহির্জগতের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। একই সঙ্গে, ভাষা ও সত্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য শব্দার্থিক কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়— যেখানে কোনো বাক্য সত্য হবে তখনই, যখন নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হবে। কিন্তু এই মডেলটি যদি আমরা সরাসরি নৈতিক বা রাজনৈতিক আলোচনায় প্রয়োগ করতে চাই, তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন, 'সামাজিক ন্যায় একটি মৌলিক মূল্য'—এই বক্তব্যটি পরীক্ষাগারে যাচাই করা যায় না, কিংবা এটি কোনো ভৌত ঘটনার সঙ্গে সরাসরি অনুরুপতায় আবদ্ধ নয়। তবু আমরা একে অর্থহীন বা মিথ্যা বলে বাতিল করতে পারি না। এখানে সত্যের প্রশ্নটি জড়িয়ে থাকে মূল্যবোধ, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, সামাজিক প্রথা এবং

সমষ্টিগত বিচারবোধের সঙ্গে। এই ধরনের ক্ষেত্রে সংসক্তিবাদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ একটি নৈতিক বা রাজনৈতিক বক্তব্য সত্য বলে গণ্য হয় তখনই, যখন তা একটি বৃহত্তর বিশ্বাসব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং সামাজিকভাবে অর্থবহ ভূমিকা পালন করে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রয়োগবাদ সত্যতত্ত্বকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রয়োগবাদ অনুযায়ী, সত্য কেবল তাত্ত্বিক সামঞ্জস্যের বিষয় নয়; বরং সত্যের একটি ব্যবহারিক দিক রয়েছে। কোনো ধারণা বা নীতি তখনই 'সত্য' হিসেবে কার্যকর হয়, যখন তা বাস্তব জীবনে সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়, সামাজিক আচরণকে অর্থবহ করে তোলে এবং মানবিক সম্পর্ককে উন্নত করে। উদাহরণস্বরূপ, "গণতন্ত্র একটি ন্যায্য শাসনব্যবস্থা"— এই বক্তব্যের সত্যতা বিচার করা হয় তার সামাজিক ফলাফল, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতার জবাবদিহিতার মাধ্যমে, কেবল কোনো একক অভিজ্ঞতালব্ধ পরীক্ষণের মাধ্যমে নয়। এই পার্থক্যগুলোর অর্থ এই নয় যে বৈজ্ঞানিক সত্য 'বেশি সত্য' এবং নৈতিক বা রাজনৈতিক সত্য 'কম সত্য'। বরং এর অর্থ হলো— সত্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কাজ করে এবং বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব বহন করে। কোথাও সত্য আমাদের প্রকৃতি বোঝাতে সাহায্য করে, আবার কোথাও সত্য আমাদের কী করা উচিত— সেই প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়।

সমন্বিত ও প্রেক্ষিত-নির্ভর সত্যতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক অবদান হলো সত্যকে একটি স্থির, চূড়ান্ত বস্তু হিসেবে না দেখে একটি কার্যকর ধারণা (operative concept) হিসেবে বিবেচনা করা। এখানে সত্য কখনো আনুষ্ঠানিক যাচাইয়ের বিষয়— যেমন গণিত বা যুক্তিবিদ্যায়; কখনো ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতা— যেমন ইতিহাস বা মানববিদ্যায়; আবার কখনো সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে যুক্ত একটি নর্মেটিভ দাবি— যেমন নৈতিকতা বা রাজনীতিতে। ফলে সত্য একক কোনো মানদণ্ডে আবদ্ধ নয়, বরং বহুমাত্রিক।

ডিজিটাল তথ্যের যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আজ একই তথ্য বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনে নির্ভুল ও নিরপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে সেই তথ্য প্রসঙ্গচ্যুত হয়ে ভিন্ন অর্থ ও ভিন্ন প্রভাব তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো পরিসংখ্যান গবেষণার ক্ষেত্রে সত্য হলেও, রাজনৈতিক প্রচারে সেটি নির্বাচিতভাবে ব্যবহার করে বিভ্রান্তিকর বর্ণনা তৈরি করা যেতে পারে। এখানে সমস্যা তথ্যের 'সত্যতা' নয়, বরং তার প্রেক্ষিত ও ব্যবহারের ধরন।

সমন্বিত ও প্রেক্ষিত-নির্ভর সত্যতত্ত্ব এই জটিলতাকে অস্বীকার করে না বা সরলীকরণ করে না। বরং এটি দেখায় যে সত্যের প্রশ্ন সবসময়ই ব্যাখ্যা, ক্ষমতা এবং দায়িত্বের সঙ্গে জড়িত। এই কারণে, সমকালীন সত্যতা-সংকট—যেমন ভুয়া খবর, তথ্যবিকৃতি এবং আস্থাহীনতা— মোকাবিলায় একক কোনো সত্যতত্ত্ব যথেষ্ট নয়। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য উপযোগী মানদণ্ডকে সংহত করে একটি প্রেক্ষিত-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর পথ।

উপসংহার:

এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় যুক্তি হলো, সমকালীন জ্ঞান-পরিস্থিতিতে 'সত্য' আর কোনো একক, চিরস্থায়ী ও সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য মানদণ্ডে ধরা পড়ে না। দীর্ঘদিন ধরে দর্শনে যে প্রত্যাশা ছিল একটি সর্বজনীন সত্যতত্ত্ব নির্মাণের, বর্তমান বাস্তবতা সেই প্রত্যাশাকে অন্তত প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার, আদালতের বিচারপ্রক্রিয়া, নৈতিক বিতর্ক কিংবা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তথ্য—এই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সত্য একইভাবে কাজ করে না। অথচ এগুলোর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সত্য শব্দটি অনিবার্যভাবে ব্যবহৃত হয়। এই টানাপোড়েন থেকেই প্রবন্ধটি একটি সমন্বিত ও প্রেক্ষিত-নির্ভর সত্যতত্ত্বের প্রস্তাব করে। এই

প্রস্তাবের মূল বক্তব্য কোনো আপেক্ষিক অবস্থান গ্রহণ করা নয়, যেখানে যেকোনো দাবি যেকোনোভাবে সত্য হয়ে যেতে পারে। বরং এখানে বলা হচ্ছে, সত্যের মানদণ্ড নির্ভর করে সেই দাবির ভাষা, উদ্দেশ্য এবং যে ক্ষেত্রের মধ্যে তা কাজ করছে তার উপর। বিজ্ঞানে সত্য যাচাই হয় পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে; সেখানে অনুরুপতাবাদ এবং টারস্কির শব্দার্থিক কাঠামো যথেষ্ট কার্যকর। অন্যদিকে নৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যের প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে মানবিক অভিজ্ঞতা, সামাজিক ইতিহাস এবং মূল্যবোধের সঙ্গে। সেখানে সংসক্তিবাদ বা প্রয়োগবাদ ছাড়া সত্যের অর্থ ধরা পড়ে না। এই পার্থক্য স্বীকার করা মানে সত্যকে দুর্বল করা নয়; বরং তাকে তার বাস্তব কার্যক্ষেত্রে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা। এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি সত্যকে একটি স্থির বস্তু হিসেবে না দেখে একটি গতিশীল ও কার্যকর ধারণা হিসেবে বোঝে। কখনো সত্য একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব, যার সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করা যায় ভাষা ও বাস্তবতার সম্পর্কের মাধ্যমে। আবার কখনো সত্য একটি ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়া, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংশোধিত হয়। কখনো বা এটি একটি নর্মেটিভ দাবি, যা সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং নৈতিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে যুক্ত। এই বহুমুখী চরিত্রকে অস্বীকার করলে সত্য হয় অতিরিক্ত সরলীকৃত, নয়তো বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন। ডিজিটাল তথ্যের যুগে এই আলোচনা আরও জটিল হয়ে ওঠে। একই তথ্য একদিকে বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনে নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য হলেও সামাজিক মাধ্যমে তা ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন উদ্দেশ্য ও ভিন্ন আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থ তৈরি করতে পারে। এখানে সমস্যাটি শুধু মিথ্যা তথ্যের নয়, বরং প্রেক্ষিত-বিচ্যুত সত্যের। একক সত্যতত্ত্ব এই জটিলতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। প্রস্তাবিত সমন্বিত কাঠামো এই ব্যর্থতাকে অস্বীকার না করে বরং সেটাকেই বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দুতে আনে। তবে এই প্রস্তাব নিজেও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়। প্রেক্ষিত-নির্ভরতার উপর অতিরিক্ত জোর দিলে কখনো কখনো সত্য ও মতামতের সীমারেখা ঝাপসা হয়ে যেতে পারে। এই ঝুঁকি স্বীকার করেই প্রবন্ধটি জোর দেয় দার্শনিক শৃঙ্খলা ও মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তার উপর। প্রেক্ষিত মানে নিয়ন্ত্রণহীন বহুত্ব নয়; বরং ক্ষেত্রভিত্তিক যুক্তিসঙ্গত মানদণ্ডের স্বীকৃতি। সবশেষে বলা যায়, সমন্বিত ও প্রেক্ষিত-সচেতন সত্যতত্ত্ব কোনো চূড়ান্ত সমাধান দাবি করে না। বরং এটি সত্য বিষয়ক আলোচনাকে আরও সংবেদনশীল, দায়িত্বশীল এবং বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার একটি পথ প্রস্তাব করে। সমকালীন সত্যতা-সংকটের মুখে এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সত্য এখন আর শুধু জানার বিষয় নয়; এটি বোঝার, ব্যাখ্যা করার এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করার একটি অনিবার্য প্রয়াস। এই অর্থে, প্রবন্ধটি সত্যকে আবার দর্শনের কেন্দ্রস্থলে ফিরিয়ে আনে— কিন্তু আগের মতো সরল ও নিশ্চিন্ত করে নয়, বরং জটিল, বহুস্তরীয় এবং মানবিক করে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Aristotle. (2009). *Metaphysics* (H. Tredennick, Trans.). Harvard University Press. (Original work published ca. 350 BCE)
2. Audi, R. (2010). *Epistemology: A contemporary introduction to the theory of knowledge* (3rd ed.). Routledge.
3. James, W. (1907). *Pragmatism: A new name for some old ways of thinking* (B. P. Bowne, Ed.). Longmans, Green, and Co.
4. Joachim, H. H. (1906). *The nature of truth: An essential inquiry* (2nd ed.). London: Macmillan.
5. Kelley, D. (1999). *The coherence theory of truth and justification*. Cambridge University Press.

6. Lynch, M. P., Wyatt, J., Kim, J., & Kellen, N. (Eds.). (2006). *The nature of truth: Classic and contemporary perspectives* (2nd ed.). MIT Press.
7. Russell, B. (1940). *An inquiry into meaning and truth*. Allen & Unwin.
8. Tarski, A. (1944). The semantic conception of truth and the foundations of semantics. *Philosophy and Phenomenological Research, 4*(3), 341–375. https://doi.org/10.2307/2102503
9. Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical investigations* (G. E. M. Anscombe, Trans.). Basil Blackwell.
10. Wittgenstein, L. (1980). *Margins of philosophy* (C. G. Luckhardt & M. A. E. Aue, Trans.). University of Chicago Press.
11. Schwitzgebel, E. (2002). *A theory of truth: Correspondence, coherence, and pluralism*. Oxford University Press.
12. Putnam, H. (1981). *Reason, truth, and history*. Cambridge University Press.
13. Davidson, D. (2001). *Inquiries into truth and interpretation* (2nd ed.). Oxford University Press.
14. Goldman, A. I. (1999). *Knowledge in a social world*. Oxford University Press.
15. MacFarlane, J. (2014). *Assessment sensitivity: Relative truth and its applications*. Oxford University Press.
16. Haack, S. (1993). *Evidence and inquiry: Towards reconstruction in epistemology*. Blackwell.